সংলাপের সমৃদ্ধ নাট্যকর্ম

জগন্নাথ ঘোষ

শম্ভু মিত্রের চাঁদবণিকের পালা সংলাপের সমৃদ্ধ নাট্যকর্ম

নাটক প্রধানত কাহিনী ও চরিত্র নির্ভর। কিন্তু এই নির্ভরতা ততক্ষণই প্রাণহীন যতক্ষণ না সংলাপের সংযোজন ঘটে। চরিত্রের মানসিকতা ও চলিষ্ণুতা মুখর হয় সংলাপে। এই মুখরতাই কাহিনীকে টেনে নিয়ে যায় কৌতূহলময় নাট্যসংকটের পরিণতিতে। সংলাপের এই গুত্বের কথা অন্য নাট্যকারের মত শম্ভু মিত্রের ভালোমতন জানা ছিল। তিনি অভিনয় ও প্রযোজনার সঙ্গে সঙ্গে লিখেছেন নাটকও। সেই নাটকের পরিণতিসাধনে সংলাপের গুত্বের বিষয়টিকে তিনি অবিসংবাদিতভাবে স্বীকার করেছিলেন। সেইজন্য তিনি লক্ষ্য রাখতেন প্রতিটি অভিনেতা তাঁর সংলাপের উচ্চারণে যেন আন্তরিক থাকে। শম্ভু মিত্র নাট্যচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি সম্পর্কিত স্মৃতিচারণায় শিশিরকুমারের সংলাপ উচ্চারণের শীলিতপদ্ধতির প্রতি সম্মান জানিয়েছেন। সঠিক উচ্চারণের মাধ্যমেই চরিত্রের মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্তহয়। সংলাপ সৃষ্টি চরিত্রের ব্যক্তিত্ব প্রকাশে যেমন সহায়তা করে, তেমনি নাট্যঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টিতে গতি দান করে। শিশিরকুমারের অভিনয়রীতি শম্ভু মিত্রকে কেন উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করেছিল একথা অনুধাবন করা এখন সুসাধ্য হয়েছে।

শম্ভু মিত্র ছিলেন একজন বিশিষ্ট রবীন্দ্র অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাটক ও উপন্যাসের নাট্যরূপ শম্ভু মিত্র তাঁর থিয়েটারে প্রযোজনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাটকের প্রযোজনায় তিনি লক্ষ্য রাখতেন সেইসব নাটকের কাহিনীগ্রন্থনা ও সংলাপ রচনার দিকে। রক্তকরবী নাটকের প্রযোজনা আজ ইতিহাস। এই নাটক প্রযোজনা করতে গিয়ে শম্ভু মিত্র নাটকটির সংলাপ নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছিলেন। তাঁর সেই, ভাবনার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর রক্তকরবী সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধে। শম্ভু মিত্র প্রযোজনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়, রাজা, বিসর্জন ও রক্তকরবী। এইসব নাটকের আবহ তার সময় ও দেশের পটভূমি অনুযায়ী পৃথক। এই পার্থক্য ধরা পড়ে নাটকের সংলাপে। তার রক্তকরবী প্রসঙ্গে প্রবন্ধে শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে দেশীধরণের বলে মন্তব্য করেছেন। এই ধরনের ছাপ পড়ে তারসংলাপে।

ইংরেজদের আগমনের পূর্বে যে বাংলা ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই ভাষাতেই বৈষ্ণব কবিরা গান লিখেছিলেন। সেইসব গান সবার কাছে প্রিয় ছিল। কিন্তু ইংরেজদের আগমনের পর বাংলা ভাষা হয়ে পড়ল কেবলমাত্র শিক্ষিত লোকের ভাষা। শম্ভু মিত্র বলেছেন ইংরেজ আগমনের পূর্বেকার বাংলা ভাষার শিকড় থেকে রস নিয়ে আমরা আজকের দিনের কথা বলতে পারি। ভিনদেশী মনোভাব না নিয়ে দেশী লোকের মতো দেশী সমস্যার কথা বলাতে পারি তাহলে আবার বাংলা ভাষা একটা বিরাট স্থানে পৌঁছুতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের সংলাপ রচনায় সেই চেষ্টাই করেছেন।

রবীন্দ্রনাটকের সংলাপের উল্লিখিত ধরনের পরিচয় শম্ভু মিত্র পান রক্তকরবী প্রযোজনার সময়। তিনি বলেছেন, এই নাটকের সংলাপ অত্যন্ত খোলামেলা। এই সংলাপ বলতে হয় পুরো হৃদয় দিয়ে। তার ফলে রক্তকরবীর সংলাপ কখনও কাব্যিক বা ন্যাকামি বলে মনে হবে না। তার ফলে এই সংলাপে প্রকাশ পায় সত্য কাব্য। শম্ভু মিত্র তাঁর উল্লিখিত প্রবন্ধে বলেছেন---অনেক দিনের অনেক চেষ্টার পর তিনি সহজ সুরে কথা তৈরী করেছেন। যা সহজাত সকল মহৎ শিল্পে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

সংলাপ রচনায় রবীন্দ্র - আদর্শ আন্তরিক ভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন শম্ভু মিত্র। একথা যেমন তাঁর অন্যান্য ন

াটক সম্পর্কে উচচারণ করা যায়, তেমনি চাঁদবণিকের পালা সম্পর্কেও। তিনি সর্বদা স্মরণ রেখেছিলেন এই নাটকের কা হিনী বাংলার মধ্য যুগের ফসল মনসা মঙ্গল থেকে আহৃত। মনসামঙ্গল যখন লেখা হয়, তখন বাংলা গদ্যভাষার উদ্ভব ঘটেনি। তখন ছিল পয়ার ত্রিপদীর ব্যাপক ব্যবহার। তাতেই প্রতিভাত হয়েছে চরিত্রগুলির আত্মিকসংকট, ভালো লাগা না - লাগার জটিলতা।

কাহিনীর মধ্যযুগীয়তার স্বরূপ ধরা পড়ে বেশ কিছু শব্দ প্রয়োগের মধ্যে। মনসার প্রতি আত্রোশ বশে চাঁদ তাকে চেঙমুড়ী ক ানী বলে অভিহিত করে। সদাগরদের কুলিক বলে সম্মান জানান হত তাদের বসতবাড়ী ছিল সুয়াবাড়ী। মহাজ্ঞান হারিয়ে শঙ্কর গাড়ী নিহত হয় সর্পাঘাতে।

মনসামঙ্গলের পালায় পাশাপাশি বিরাজ করে লৌকিক ও অলৌকিক নানা ঘটনা। মনসার প্ররোচনায় কালীদহে প্রাকৃতিক বিপর্যয় চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিয়েছে, প্রাণ গিয়েছে নাবিকদের। কিন্তু নিতান্ত ভাগ্যের অবিশ্বাস্য সহযোগিতায় চাঁদ দেশে ফেরে ভিখারীর বেশে নিউটিয়্যা হয়ে। লখিন্দরের বিবাহের রাত্রে সাঁতালি পর্বতের লোহারঘরের দেয়াল মনসার নির্দেশে ছিদ্রযুক্ত হয়। সর্পাঘাতে মৃত লক্ষিন্দরের দেহ কলার মান্দাসে তুলে নিয়ে বেহুলা গাঙুরের স্রোতে ভেসে চলে স্বর্গলোকের উদ্দেশ্যে। লৌকিক ও অলৌকিকের এ এক অভূতপূর্ব সহাবস্থান। অবেশেষেবেহুলা স্বর্গলোকে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে নৃত্য প্রদর্শনে সে খুশি করে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে স্বয়ং মহাদেবকে।তারপর সে পুনর্জীবনপ্রাপ্ত স্বামী এবং ছয় ভাশুরকে নিয়ে ফিরে আসে চম্পক নগরীতে। শর্ত অনুযায়ী ফিরে পাবার আশায় মনসাকে বিল্বপত্র দিয়ে পূজা দিতে মনস্থ করে।

মধ্যযুগীয়তার আবহে লৌকিক ও অলৌকিকের সহাবস্থান চাঁদ বণিকের পালায় পরিলক্ষিত হবে। কিন্তু তিনি যেহেতু বিশশতকের পটভমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর নাটকের কাহিনীসূত্রের জট খুলেছেন সেইহেতু তাঁকে লৌকিকের কাছেই মাথা নোয় াতে হয়েছে। তার জন্য তাঁকে তাঁর নাটকীয় কাহিনীর পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে। লখিন্দর যখনই শুনেছে তার পিতা তাকে ফিরে পাবার জন্য মনসাকে পূজা দিতে বাধ্য হয়েছে, তখনই সে সস্ত্রীক বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। চাঁদ তখন পুনরায় সমুদ্রে পাড়ি দিতে বেরিয়ে পড়ে নিতান্ত অন্তঃপ্রকৃতির আহ্বানে, তার তখন আর পিছুটান নেই।

তাঁর নাটকে লৌকিক ও অলৌকিকের অবস্থান নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে বিরোধ ও প্রতিরোধের নাটকীয় বিন্যাস। এই বিন্যাস এই বিন্যাসের ভাষা নির্মাণে নাট্যকার যে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন তা নাটকটি পাঠ করলেই আমরা বুঝতে পারি। নাটকের প্রথম পর্বের শুতেই আমরা দেখি চাঁদ পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার নাবিক সঙ্গীরাপূর্ণোদ্যমে প্রস্তুতিপর্ব রচনা করেছে। তাদের মনে সাহস যোগাবার জন্যে চাঁদ বলে -- ভাসিব, -- এট্টা কথা মনে রাখা চাই, যে, দিনরাতেতে বুকে ভরসা রেখো, আমাদের জয় হবেই হবে---

চাঁদ যতই তার নাবিক সঙ্গীদের মনে সাহস জোগাক, কিছু নাবিক আছে এই দলে, যারা ব্যক্তিগতভাবে পাড়ি দেওয়াকে অ াদর্শ গত ভাবে মেনে নিতে পারেনি। তারা সুযোগ খুঁজতে থাকে কেমন করে পাড়ি দেওয়ার হাত থেকে নিস্তার মেলে। এই সুযোগ এনে দিয়েছে চম্পক নগরীর মান্ডলিক বেণীনন্দন। সে বানিজ্যযাত্রার বিরোধী। সেইজন্য সে এসে হাজির করে মহাম ান্ডলিক বল্লভাচার্যকে। বেণীনন্দন লক্ষ্য করেছে, চাঁদ চম্পক নগরীর শান্ত পরিবেশকেঅশান্ত করে তুলেছে। চাঁদের লোকের া বেণীকে হাঁড়গিল্লা বলে, এই লোকগুলি বেণীর কথায় চেঙড়া। বেণীনন্দন আশংকা প্রকাশ করে বল্লভাচার্যকে বলে - চঁ াদের উসকানিতে চেঙড়ারা চম্পক নগরীর শাসনবিধিকে তছনছ করে দেবে। রাষ্ট্রের শাসনবিধি অক্ষুন্ন রাখাই প্রধান কর্তব্য বেণীর। এই ব্যাপারে সে মধ্যস্থ হিসাবে বেছে নেয় মহামান্ডলিকবল্লভাচার্যকে। বেণী তাঁকে স্পষ্ট করেই জানায় -- ত াই প্রভু। নিয়মেরএকপারে আমি, অন্য পারে চাঁদ।

চাঁদ বণিকের পালা তাই বিরোধের নাটক। এই বিরোধ বেণীনন্দন ও চাঁদ বণিকের মধ্যে। চাঁদ সমুদ্রে পাড়িদেবে। কিন্তু বেণীর তাতে সম্মতি নেই। কিন্তু চাঁদের বিদ্ধতা করতে গিয়ে চাঁদের চেঙড়া সঙ্গীদের একটি মন্তব্য টেনে আনে বেণী। চেঙড় াদের মতে, বেণী এক হাড় গিলা। বেণীর বক্তব্য হল, তার বিদ্ধে বিদ্রুপ বর্ষণের ব্যাপারে চাঁদের প্ররোচনা বিদ্যমান। এই প্ররোচনার দ্বারা চম্পক নগরীতে অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হবে আইনের শাসন থাকবে না। বেণীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক প্রশ াসনের কর্তাদের। বেণী চায় চাঁদকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে। তার সমুদ্রে পাড়ি দেয়ার প্রয়াস খতম করতে সমুদ্র যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা অরোপ করে। এই ব্যাপারে বেণী নিয়োগ করে বল্লভাচার্যকে। এই সময়ে বেণীর আচরণ ও কথা বড়ো বেশি চ াটুকারিতায় ভরা। বল্লভাচার্য এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি দেখেছেন তাঁর ক্ষমতায় ভাগ বসাচ্ছে বেণী। কিন্তু তবু বেঁচে থাক

ার আকুলতায় বেণীকে মান্য করতেই হয় বল্লভাচার্যকে। চাঁদ তাঁর প্রিয়ভাজন ছাত্র উন্নত চরিত্র, আদর্শবান এবং আত্মবিশ্বাসী। এ হেন ছাত্রকে তার আদর্শকে বিসর্জন দেওয়ার কথা বলতে হবে। তার আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরাতে হবে। বল্লভাচার্য চাঁদকে পাড়ি দেওয়া থেকেনিবৃত্ত করার জন্য বড় অসহায়ভাবে জানান -- জগতে এ যেন এক অকাল নেমেছে, তারই ডরে। দোখ না, জ্ঞানের সম্মান নেই, বিদ্যার মর্যাদা নাই, সুভদ্র আচার নাই, সুভাষণ নাই, মাংসসুখ ছাড়া অন্য কোন সুখচিন্তা নাই, --ভুল্যে যাও, চন্দ্রধর, মহৎকার্যের কথা ভুল্যে যাও। শুধু কোনোমতে নিজেরে বাঁচেয়্যা রাখো। আদর্শের পাছে ছুট্যে কোনো লাভ নাই।

বল্লভাচার্য একজন ধীমান ব্যক্তি। চম্পক নগরীতে এখন বিরাজ করছে চরম অন্ধকার। এই অন্ধকারকেআহ্বান জানাচ্ছে বেণী প্রভৃতি উচ্চাভিলাষী ক্ষমতালোভীরা। এখানে চাঁদ বণিকের কোন ঠাঁই নেই। এই চরম সত্য অনুধাবন করেই বল্লভাচার্য বেণীর মুখ রক্ষার জন্য নিজের বিবেক বন্ধক দেন বেণীর কাছে। তাঁকে যান্ত্রিকভাবে ঘোষণা করতে হয় চাঁদের পাড়ি দেওয়ার বিদ্ধে নিষেধ বাণী। অবশ্য চাঁদ এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। সেইতাঁর সঙ্গী নাবিকদের উদ্দেশ্যে গলায় দৃঢ়তা ঢেলে বলে---ভাইরে, আমি জানি, আমার এ দেশের অন্তর মরে নাই।সে তো আমাদেরডাকে। চলো, চলো চলো---

তাঁর পরম শ্রদ্ধাভাজন গু বল্লভাচার্য চাঁদকে আদর্শ ত্যাগ করে সহজ জীবনাচরণে মনোযোগী হবার আদেশ দিলেও চাঁদ সেকথা শিরোধার্য করেনি। তার এই প্রয়াসের সঙ্গে শ্রদ্ধেয় শঙ্খ ঘোষ মিল খুঁজে পেয়েছেন হার্মউন্ডের লেখা ডিসকভারি নামের বিখ্যাত একটি একাঙ্কিকার দেশ আবিষ্কারক কলম্বাসের বালক ভৃত্য পেপের। সে তার প্রভুর আদর্শকে হৃদয় মন দিয়ে পালন করতে চায়। জাহাজের সবাই যখন বিভ্রান্ত তখন পেপেই কেবল বলেছিল---When a man is given a vision, he must follow it alone.'

নাটকের দ্বিতীয় পর্বে চাঁদ তখন সর্বস্বান্ত হয়ে চম্পক নগরীতে ফেরে, তখন সে একজন ব্যর্থ নাবিক। সে নিজেই বলেছে--- আমি একট্টা বিফল মানুষ। তার আগমনবার্তা কানে গেছে বেণীর। সে তখন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে খবর নিতে থাকে চাঁদের বিদ্ধে জনমনে প্রতিক্রিয়া কেমন রূপ ধারণ করেছে। সে তখন ক্ষমতার উচ্চমঞ্চে। বল্লভাচার্য ক্ষমতাচ্যুত, কিন্তু বেণীর প্রসাদপুষ্ট। বেণী বুঝে গেছে ক্ষমতার অলিন্দে চড়লে ক্ষমতালোভী মতলববাজেরা সুযোগের সন্ধানে থাকে। এই সব বিরোধীদের সঙ্গে মোকাবিলায় দরকার কিছু মানুষের। এই মানুষের অন্যতম হল চাঁদ সদাগর। বেণী চাঁদকে দলে পেতে আগ্রহী। কিন্তু চাঁদ যদি সরাসরি দলে আসতে সম্মত না হয় তবেচাঁদের ব্যক্তিচরিত্রেকলঙ্ক আরোপিত হবে। এবারেও বেণীর দরকার পড়ে বল্লভাচার্যের। দেখা গেছে, চাঁদকে বেণীর দলে যোগদানের অনুরোধ জানালেও বল্লভাচার্য বলতে ভোলেননি --- আশা রেখো মনে আশা রেখো, চন্দ্রধর, আশা লুপ্ত হয়্যা গেলে সর্বনাশ হয়। বলাবাহুল্য, চাঁদ পাড়ি দেওয়ার আশা বুকে নিয়েই বেণীর দলে যোগ দেয়।

চাঁদ বণিকের পালা, এককথায় বিরোধের নাটক। এই বিরোধ জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের। আলোর সঙ্গো অন্ধকারের। আলো ও জ্ঞানের পক্ষে চাঁদ। আর অজ্ঞান ও অন্ধকারের পক্ষে মনসা। মনসার দলে আছে বেণী, সনকা এবং চম্পক নগরীর নরনারীরা। এদের এককথায় বলা হয় অন্ধকারের জীব। এই অন্ধকারের ভাষা প্রয়োগে এদের মানসিকতার প্রকাশে আছে একমুখীন ভাবনা। বেণী চাঁদের পাড়ি দেওয়ার বিদ্ধতা করে। তার ক্রিয়াকলাপ প্রকাশিত হয়েছে যেমন তার আচরণে তেমনি তার ভাষায়। বেণীর দুর্ভাগ্য, চাঁদের বিরোধিতা করতে গিয়ে ক্ষমতার অলিন্দ থেকে সে ছিটকে গেছে। তারই পুত্র সুবল তাকে পরাভূত করেছে। নাটকের তৃতীয় পর্বের শেষাংশে ন্যাড়া চাঁদকে জানায় --- সেই যে সুবল --- বেণীনন্দনের ছেলে--- সে নিজের বাপেরই হত্যা করা সিংহাসন কেড়েনিয়েছে। আর অনুগত যে সব লোকেদের বেণীনন্দন নানাস্থানে ভুইঞা করা দিয়েছিল তারা বেশীভাগ নাকি আজ সুবলের পক্ষে গেছে। ছিঃ ছিঃ মনসা, মনসা সর্বত্র। শিব নাই সদাগর, শুধু মনসা সর্বত্র। শিব নাই সদাগর, শুধু মনসা রয়েছে । চম্পক নগরীকে গ্রাস করেছে আঁধার রূপিনী মনসা। এই আঁধার কেড়ে নেয়, ন্যায় নীতি মুক্ত জীবনের চলিষ্ণুতা। যার জন্য ছেলে তার পিতার প্রাণসংহারে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। সনকা চাঁদ বণিকের স্ত্রী। সে মনসার পূজারিণী। নাটকের প্রথম পর্বে সনকা মনসার স্তুতিতে নির্বিকার কণ্ঠে জানায়---

তুমি যে অজ্ঞেয় দেবী, নিয়মাপহারী।
ভক্তেরে বাঁচাও তুমি ওগো বিষহরি।।

মনসা নিয়মের অপহরণ ঘটান। তাঁর কাছে অনিয়মই একমাত্র নিত্যমান্য। এই মনসাকে চাঁদ অমান্য করে বলে, সনকার চোখে চাঁদ মূর্খ। কিন্তু চাঁদ তাতে বিচলিত হয় না। চাঁদের অবিচলিত মানসিকতাকে মেনে নিতে পারেনি সনকা। অবশ্য সময়

যত অতিবাহিত হয়েছে মনসার সাধনা তার অভীষ্ট সিদ্ধির পথকে আরো দূর্গম করে তলেছে। অবশেষে সনকা নিজেই হয়েছে পাগলামির শিকার। নাটকের শেষে জনৈক ব্যক্তির মুখে শোনা গেছে মনসাকণ পরিণতি--- দেখেছ তো, সনকা পাগলহয়্যা কত সুখে আছে?

সনকার পাগলামি তাকে যাবতীয় দুঃখ ও যন্ত্রণা ভুলিয়েছে। চম্পক নগরীর অন্ধকারের জীবেরা ন্যায় নীতিনিয়মলোকলজ্জা বিসর্জন দিয়ে নির্বিকার চিত্তে যাবতীয় অপকর্ম সাধন করে গেছে। এই জীবেদের তালিকায় আছে করালী, বণমালী কেবট্ট এবং আরও অনেকে। পাড়ি দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে চাঁদ ফিরে আসার পর উল্লিখিতরা শঙ্কিত হয়। চাঁদ যদি পুনরায় পাড়ি দেওয়ার কথা ঘোষণা করে তবে তাদের অস্তিত্ব বিঘ্নিত হবে। এইরকম পরিস্থিতিতে কেবট্ট বলে ঠিক - ঠিক, ঠিক - ঠিক, ঠিক - ঠিক। (হঠাৎ থেমে) এক কাজ কর। সকলে এখনি যায়া ওর নামে কুৎসা করে বেড়াও। যা কিছু মাথায় আসে। অন্ধকারের জীবেদের বদবুদ্ধি যে কতখানি হীন এবং নীচ, তার পরিচয় মেলে কেবট্টের কথায়। এইসব কুৎসা রটনাকে চাঁদ অবশ্য আমল দেয়নি।

বনমালী বলেছিল--- কৌটিল্যের নীতিবাক্য একেবারে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখা। চলো - চলো, মুখে - মুখে নিন্দা নিয়্যা ঘরে - ঘরে লেগে পড়ি চলো---

বণমালী বেনীনন্দনের হাত শক্ত করার জন্য চাঁদের নামে বদনাম রটাতে দ্বিধা করেনা। কিন্তু করালীও সুযোগের সন্ধানে থাকে কেমন করে বেণীনন্দনের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া যায়। সে সরাসরি চাঁদকে বেণীনন্দনের বিপক্ষ দলে যোগ দিতে আহ্বান জানায়। সে চাঁদকে বলে--- সদাগর, আমরা ন্যায়ের পক্ষে, আমরা সত্যের পক্ষে, বেণীরে তাড়ায়ে য়াতে চম্পক নগরে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তারি তবে চেষ্টা করি আমরা সকলে। তুনি আমাদের সাথে যোগ দেও, নাবিক প্রধান।

করালীর মুখে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চত্রান্ত। এই চত্রান্তে যোগ দেওয়ার জন্য করালী চাটুকারবৃত্তি অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করেনি। প্রবল ধীশক্তিসম্পন্ন চাঁদ করালীর চাটুকারিতায় বিভ্রান্ত হয়নি। কারণ ক্ষমতার লড়াইয়ে তার কোন আগ্রহ নেই। সে চায় পাড়ি দিতে। অন্ধকারের জীবেদের তালিকায় আছে চম্পক নগরীর অনেক যুবকযুবতী যাদের কাজ চাঁদের বিদ্ধতা করা। বিবাহের রাত্রে সাতালি পর্বতের মাথায় তৈরি লোহার বাসরঘরের দেয়ালে ছিত্র রচনার জন্য তারা দুরভিসন্ধি আঁটে। লোহার বাসর রচয়িতা তারাপতি কর্মকারকে তারা উৎকোচ প্রদানের লোভে দুর্বল করে দেয়। তারা ভয় দেখায় তারাপতিকে-- বিয়াযোগ্য কন্যা এক আছে না তোমারই সাবধানে চলো।

এই যুবকযুবতীরা বিবাহ রাতে লোহার বাসর ঘরে সাপ ঢুকিয়ে লখিন্দরকে সর্পাঘাতে হত্যা করে। তারপর তারা চাঁদকেও ব্যক্তিভাবে আত্রমণ করতে দ্বিধা করে না। ন্যাড়া চাঁদকে আগলে রাখে বলে তারা বলে --- বুদ্ধি করা তুমি বুড়ারে বাঁচাতে চাও। কিন্তু এর পাছে যেই দিন আমাদের হাতে নাতে ধরা পড়্যে যাবে। বাড়ি মেরে - মেরে ইন্দুরের মতো মেরে ফেলা দিবা। এই কথা সঙরিয়া রেখো।

চাঁদ বণিক যাবতীয় নিষেধ, প্রতিরোধ ও সংকটের মুখোমুখি হয়েও সর্বদাই অবিচলিত থেকেছে। কোনও প্রতিত্রিয়ার শিকার হয়নি। মাঝে মাঝে বেণীনন্দন বা করালীদের মুখে যখন সে শুনেছে পাড়ি দেওয়ার স্বপক্ষে অনুকূল সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি, তখন চাঁদ প্রকাশ করেছে তাঁর অন্তরের সংশয়। এই সংশয়, বলাবাহুল্য অবিশ্বাস থেকে জন্ম নিয়েছে। বল্লভাচার্যের মুখে বেণীনন্দনের সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতির কথা শুনে চাঁদ বলেছে--- বেণী? সে দিবে সাহায্য? পাড়ি দিতে ?

করালী এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের কাছ থেকে চাঁদ যখন শোনে তার পাড়ি দেওয়া ব্যাপারে, উপযুক্ত সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি তখনও চাঁদ বলে--- (ফিরে হাত জোড় করে) আমারে চিন্তোতে দেও। (নিজের সঙ্গতি ঢের কথা কয়া নিতে বাকি আছে। এট্ট সময় দেয়।

নাটকের শেষে চাঁদ অবশ্য পাড়ি দিয়েছে। এক বিষণ্ণ মূহূর্তে তাকে সেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। লখিন্দর যখন শুনেছে মনসার কাছে চাঁদের প্রণাম নিবেদনের মাধ্যমে তার পুনর্জীবন প্রাপ্তির বৃত্তান্ত, তখন অপমানে ও আত্মধিক্কারে সে সস্ত্রীক বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। এই আত্মহত্যা মনসার বিদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। মনসার কাছে আত্মসমর্পণের থেকে, মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। শেষ বিচারে আন্ধার রূপিণী মনসার জয় প্রতিষ্ঠা পায় না। একমাত্র জ্ঞানের শিবই চিরন্তনভাবে জয়ী হন। এই জয় আগে অনেক দুঃখের আঁধার রাত্রি পেরিয়ে। বলাবাহুল্য এই রাত্রির অবসানে আসবে নতুন দিনের ভোর। চাঁদ নিজের মনেই বলে, এ আন্ধারে চম্পকনগরী তবু পাড়ি দেয় শিবের সন্ধানে। পাড়ি দেও---পাড়ি দেও--- শিবের সন্ধানে

সমগ্র চম্পক নগরী পাড়ি দেবে আঁধার থেকে আলোয়। মনসার আসন বিচলিত হবে শিবের জ্ঞানের আলোয়।
চাঁদের এই উক্তিতে বোঝা গেল চাঁদ শেষ পর্যন্ত সব প্রতিরোধ হাটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। তার প্রতিপক্ষরা হয় পরাজিত, নয় বিধবস্ত। অন্ধকার চিরকালের জন্য নয়, ক্ষণকালের জন্য সাম্রাজ্য বিস্তার করে। শেষ পর্যন্ত জয়ী আলো। এই আলোর তপস্যার নাট্যরূপ চাঁদবণিকের পালা। এই তপস্যার নাট্যরূপ দিতে গিয়ে নাট্যকার উপযুক্ত সংলাপের আমদানি ঘটিয়েছেন।
আলোর তাপস যথার্থ সত্যসন্ধী বীর. অন্ধকারের বিদ্ধে আলোর সংগ্রামে যে জয়ী হয়, সেই তো বীর। লখিন্দর সেই অর্থে তার জন্মদাতা পিতাকে বীরের আসনে বসায়। কিন্তু অন্ধকারের জীবেরা চাঁদকে টেনে নামাতে চায় অপমানকে রসাতলে। তাতেই লখিন্দরের মনে যুগপৎ জাগে দুঃখ ও অভিমান। সে দেখেছে চম্পক নগরীতে অনেকেই অর্থে বিত্তে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছে। লোকে তাদের বীর বলে। কিন্তু চাঁদ পাড়ি দিতে গিয়ে ব্যর্থ ও পরাজিত হয়ে ফিরে এলেও লক্ষিন্দরের কাছে সে বীর। সেই বীর আজ শুধু সাধারণ গৃহস্থ হয়ে দিন যাপন করবে, একথা ভাবতে পারে না লখিন্দার। তাতে প্রবাদপ্রতিম সদাগর বংশের মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকে না। অথচ সেই সদাগর বংশের সন্তান তো লখিন্দার। কিন্তু আজ তার পরিচয় নিয়ে লখিন্দর সুখী নয়। সে কণ কণ্ঠে তার মা সনকাকে বলে, ঘটনাটা বুঝে দেখো তুমি। আমাদের ইতিহাসও তার আত্মস্থ র পের কোনো সন্ধান পায় নাই। শুধু মুখোশের পরে মুখোশ বদলে গেছে? তাই আমাদেরো আজ কোনো পরিচিতি নাই।
লখিন্দার তার যথার্থ পরিচিতির কাঙাল। সে জানে তার পরিচিতি নিহিত সদাগর বংশের পাড়ির ব্রত উদ্‌যাপনে। পাড়ি দেওয়া যাদের ব্রত, তাদের কাছে সাংসারিক সুখের কোন দাবি থাকে না। লখিন্দর তাই ব্যর্থ পরাভূত চাঁদ সদাগরকে বলে--- তুমি পাড়ি দেও পিতা। পুনর্বার পাড়ি দেও তুমি।
চাঁদ পাড়ি দিতে অপারগ নয়। কিন্তু সে চায় তার সদাগর বংশাভিমানীপুত্র লখিন্দর তার বদলে সমুদ্রে পাড়ি দিক। চাঁদ ক াতর অনুনয়ে লখিন্দরকে বলে, হবি। বীর হবি, বল? সমুদ্দুরে পাড়ি দিবি? আমার শেষ সমুদ্দরে? বল্ পাড়ি দিবি? বলাব াহুল্য লখিন্দর বীর আখ্যা পাওয়ার অভিলাষে পিতৃআজ্ঞায় সমুদ্রে পাড়ি দিতে স্বীকৃত হয়। যে পরিচিতির জন্য লখিন্দরের মনে জেগেছিল অভিমান ও দুঃখ, আজ তারই পিতার কল্যাণে তার সে রঞ্জিত পরিচিতি লাভের শুভমুহূর্ত উপস্থিত।
কিন্তু সেই শুভমুহূর্তকে অশুভে পরিবর্তিত করে দেবার ষড়যন্ত্রে মেতেছে চম্পক নগরীর অন্ধকার জীবেরা।লখিন্দরের পাড়ি দেবার জন্য যতগুলি নৌকা তৈরি করা হয়েছিল, সবকটাই ঐ জীবেরা ফুটো করে রেখে দিয়েছে। চম্পক নগরীর এই বীভৎস পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন লখিন্দর। সে বিবাহের রাত্রে সাঁতালি পর্বতের মাথায় তৈরি লোহার বাসরের চ াতালে উঠেছে। এখানে বেহুলার সঙ্গে তার মিলন লগ্নের প্রত্যাশিত পটভূমি রচিত হয়েছে।বেহুলার প্রেম লক্ষিন্দরকে নিয়ে যাবে যাবতীয় নীচতা ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে। লখিন্দর বেহুলাকে কাছে নিয়ে গদ্‌গদ প্রেমের আবেশে বলে -- আজ মোরা অনেক উপরে। আকাশের কাছাকাছি।
আকাশ পার্থিব সংকীর্ণতাকে আগ্রহ্য করতে পারে অনায়াসে। লখিন্দরের প্রেমিক হৃদয়ের উপলব্ধি যথাথই অভিনব। লে াহার বাসর ঘরকে লখিন্দর বানাতে চায় চিরন্তন প্রেমের লীলানিকেতনে। এই বাসরঘর যেন লোহার পিঞ্জর না হয়। এই ছিল লখিন্দরের বাসনা।
প্রেমের অনাবিল অনুভূতি বেহুলাকেও অভিভূত করে। নাট্যকার জানিয়েছেন, বেহুলা লখিন্দরের আঁকড়েধরা হাত দুটি নিজের গালে চেপে চোখ বোজে। কিন্তু যতই লখিন্দরের মুখে প্রেমের বিচিত্র মহিমার প্রকাশ ঘটুক, সে চম্পক নগরীর বিষ াক্ত অন্ধকার পরিবেশ ভুলতে পারে না। সে বেহুলাকে জানায়, উঃ, মানুষে যে এত ভন্ড হতে পারে, তা এই চম্পক নগরীট্য ারে যারা না দেখ্যেছে তারা কিছুই জানে না।
প্রেমের মায়াবী লীলায় স্নাত বেহুলার কাছে লখিন্দরের মুখে বারবার চম্পক নগরীর সংকীর্ণ চেতনার নিষ্ঠুর উল্লেখ ভাল ল াগে নি। তার মনে হয়েছে, লখিন্দর দোলাচলতার শিকার। এই রকম মানুষের পক্ষে অভীষ্ট লাভের আশা বৃথা। সে বলে --- এট্টা কথা কই আমি বিরক্তি বেশো না। এত ক্লোধ, এতো ঘিন্ন্যা-ই য়াতে নিজ মনে স্থিতু পাওয়া যায়? মোর বাপে কয় --- মনে যদি জ্বালা রাখো তাহলে নিজেরি মন অবনষ্ট হয়। তার চায়্যা ঢের ভালো ভুলে যাওয়া আর, ---আর, আপন কর্তব্য করা।
বেহুলার কথায় প্রকাশ পায় তার পিতৃ পরিবার কোনও সামাজিক সাংস্কৃতিক ও নৈতিক সংঘাতের মুখোমুখি হয়নি। তাই চ

ম্পক নগরীর বিষাক্ত পরিবেশে সে অচেতন। এখানে জয়ী হলে জীবনে সম্মান পদক ইত্যাদি মেলে। কিন্তু আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও যদি পরাজয় বরণ করতে হয় তবে চম্পক নগরীর মানুষ সেই পরাজিতকে নানাভাবে যন্ত্রণাদগ্ধ করে তোলে। লখিন্দর তার পরাজিত পিতা চাঁদের উদাহরণ সামনে রেখে চম্পক নগরীর পরিবেশকে চাক্ষুষ করেছে। সে বেহুলাকে বলে--- সুরক্ষিত সংসারের দ্বীপ হতে এয়াছ যুবতী, জানো নাক এইখানে কালীদহে ঘুর্ণাচক্র আছে। এই ঘূর্ণাচক্রই লখিন্দরকে নিরন্তর অস্থির করে রাখে। এই অস্থিরতা তার অস্তিত্বের শিকড় ধরে টান দেয়। যেহেতু বেহুলা লখিন্দরের বিবাহিতা স্ত্রী, সেইহেতু তার মতে ঐ অস্থিরতা বেহুলাকেও গ্রাস করবে। লখিন্দর বলে--- এই অস্থিরতা সংক্রামিত হবে তোমারও অন্তরে।

কিন্তু বেহুলার স্পষ্ট জবাব --- না, আমি স্থির হবো।....আমার স্থিরতা যেন সংক্রামিত হয় তোমাদের অস্থির সংসারে।

লখিন্দর চায় বেহুলা তার অস্থির জীবনে নিবিড় দ্বীপের মত শান্ত হয়ে থাকুক। প্রেমের বিহ্বলতায় লখিন্দর বেহুলাকে বলে---নাচুনী বেহুলা তুমি নিছনি কামিনী, দ্বীপ হয়ো অপরূপ দ্বীপ হয়ো আমার জীবনে---

বেহুলা যদি লখিন্দারের কাছে অপরূপ দ্বীপ হয় তবে লখিন্দরকেও বেহুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু তাকি সম্ভব? লখিন্দর তো সমুদ্রে পাড়ি দিতে যাবে। তখন তো আসবে বিরহেরি বেলা।

চাঁদ বণিকের পুত্র তো পাড়ি দিতে বেরিয়ে পড়বেই। ক্ষণিকের বিভ্রান্তিতে বেহুলা লখিন্দরকে পাড়ি দিতে নিষেধ করে। কিন্তু পরক্ষণেই সে ধরতে পারে তাকে গ্রাস করেছিল কোন এক ছায়ামূর্তি ।এই ছায়ামূর্তি যেন কোন শক্তি। সেই শক্তির আবেশে বেহুলার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে লখিন্দরের সমুদ্রে পাড়ি না দেবার আহ্বান। বেহুলার মুখেছায়া মুর্তির উল্লেখে বোঝা গেল, বেহুলাকে গ্রাস করতে চলেছে লখিন্দর কথিত অস্থিরতা এই অস্থিরতাবেহুলাও লখিন্দরের প্রেমের পথে আনে বাধা, আনে বিরোধ। কাতরকণ্ঠে তাই লখিন্দর জানায়--- তুমি তো জাননা বেহুলা, জীবনের প্রতিযোগিতায় পদে পদে এতো গ্লানি, এতো কুটিলতা, পৃথিবীর বুক থিকা এরা যেন প্রেম অনুভবট্যারে নষ্ট করে দিতি বদ্ধপরিকর।

অবশেষে লখিন্দরের কথাই সত্য হল। সর্পদংশনে মৃত্যু হল লখিন্দরের। এই সর্পকে লোহার বাসর ঘরের দেয়ালের গোপন ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল চম্পক নগরীর অন্ধকার জীবেরা। দৈববলে প্রাণ ফিরে পেয়েও লখিন্দর কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুনর্জাবন প্রাপ্তিকে উদার মনে গ্রহণ করেনি। কারণ এই প্রাপ্তির পশ্চাতে রয়েছে মনসা তথা অন্ধকারের কাছে আত্মসমর্পণের অঙ্গিকার। তাই স্বেচ্ছায় বিষ পান করে লখিন্দর সেই পুনর্জীবন প্রাপ্তিকে বিদায় দেয়। বেহুলার কাছ থেকে পাওয়া বিষ গলাধঃকরণ করে লখিন্দর বেহুলাকে জানায় --- শুন্যে যা বেহুলা তুই আজ সত্যকার জীবনের মন্ত্রদিলি লখিন্দরে তোর।

নাটকটি যে সর্বশেষ সিদ্ধান্তে পাড়িরই নাটক, তাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। লখিন্দরের শেষ সংলাপই সে কথাই স্পষ্ট হয়।

চাঁদ বণিকের পালায় অধিকাংশ সংলাপ গদ্যে রচিত। মনসামঙ্গল কাব্য যে সময় রচিত হয়, অর্থাৎ মধ্যযুগে বাংলা গদ্যের আবির্ভাব ঘটেনি। কিন্তু বিশ শতকের মধ্যবর্তী পটে দাঁড়িয়ে শম্ভু মিত্র যখন তাঁর নাটক লিখতে বসেন সেই মনসামঙ্গলের কাহিনীকে কেন্দ্রে রেখে, তখন গদ্যে তার সংলাপ রচনার কথা ভাবতে হয়। কিন্তু এই গদ্য মধ্যযুগীয় পয়ারের বেড়িতে বাঁধা। অতি সাধারণ নারীপুষ থেকে শু করে উচচবংশীয়রা একই লক্ত ব্যবহার করেছে। বাংলা নাটকের সংলাপে এতদিন চলে আসছিল নিম্নবর্গীয় ও উচচবর্গীয় ভাষা বিভাজন রীতি। চাঁদ বণিকের পালায় শম্ভু মিত্র সেই রীতি পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করেন নি। চম্পক নগরী নামে হলেও গ্রাম্যতারবেড়ি টপকাতে পারে নি। তার জন্য একজন নামহীন নাবিক তার সহকর্মীকে ভাইরে বলে সম্বোধন করে। তারা কঠোর পরিশ্রমকে শিরোধার্য করে অপরকে বলে--- আমরা হই জোয়ান। তাই ত আমাদের তরে ভাই চাকুরী গদি নাই।

বাংলা গদ্যের প্রচিত রীতিতে কর্তার পরে ক্রিয়ার আগমন ঘটে না। নাট্যকার সেই রীতি বদলে দিয়ে আনায়াসে লিখছেন --- আমরা হই জোয়ান।

চাঁদ, তার সংলাপে একাধিকবার বলেছে---পাড়ি দিয়েছিনু, ঘর বেদ্ধেছিনু। সে বলেছিল---তুমি তো উলঙ্গ শিব তাই মেরে বুঝি উলঙ্গ করাতে চাও?

ছিনু, মোরে, তার প্রভৃতি ব্যবহার গদ্যেই মানানসই। পদ্যের স্বাভাবিক ব্যবহার নাট্যকার গদ্যসংলাপে নির্বিবাদে ব্যবহার

করেছেন।

আসলে এই নাটকের সংলাপ গদ্যে রচিত হলেও, প্রবহমান পয়ারের বন্ধন অস্বীকার করেনি। এই প্রসঙ্গে বল্লভাচার্যের একটি সংলাপ আমরা স্মরণ করতে পারি---

উপরে বিধাতা আছে, আর নীচে সব ভালো থিক্যা ভালোতর হয়েই চল্যেছে। তাই বলি চন্দ্রধর, নিজেরে বাঁচ্যাও। তুমি এইকালে চুপ কর্যে থাকো তাইলে সবারে মিলে তোমার যা মিথ্যা পরিচয় সেইটাই আরোপিত করে দিবে।

সংলাপের এই গদ্যকে ১৪ মাত্রায় পয়ারে সাজানো যায় অনায়াসে। ব্যবহারিক গদ্যের মধ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টির তাগিদে পদ্যচ্ছন্দের স্পন্দন যে আনা যায় তা শম্ভু মিত্র দেখিয়ে দিলেন চাঁদ বণিকের পালা লিখে। অনেক ক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়াপদে শব্দের অন্তে " ্য " -ফলা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কর্যে বস্যে কেট্যা ইত্যাদি। নাটকে ভূমিকায় নাট্যকার সেই ব্যবহারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন সঙ্গত কারণেই। মাঝে মাঝে শব্দের মধ্যে অ্যা উচ্চারণের সাহায্যেলেখা হয়েছে---বাঁচেয়্যা, নেউটিয়্যা, নিয়্যা প্রভৃতি ভালবাসার সাদৃশ্যে ভালবাসার ব্যবহার একাধিকবার লক্ষ্য করা যাবে এই নাটকে।

সংলাপ রচনায় নাট্যকার খুব সাবধানী ছিলেন। মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য আনয়নে তিনি যেমন কাহিনী গ্রন্থনার চরিত্র নির্মাণের, ঘটনার উপস্থাপনায় সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, তেমনি সংলাপের ভাষায় তিনি আরোপকরেছেন পদ্যের বৈভব। একজন নাট্যকার নাটক রচনার মুহূর্তে স্থানকালপাত্র সম্পর্কে কতখানি সচেতন থাকেন, তার উজ্জ্বল উদাহরণ চাঁদ বণিকের পালা। শম্ভু মিত্র যে জাতীয় নাট্যের সন্ধানে ছিলেন, এই নাটক সেই বাঞ্ছিত জাতীয় নাট্যের পর্যায়ে পড়ে। তার সংলাপ তার পরিচয় দেয়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com